MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.vanguardonline.info | www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
মার্চ-এপ্রিল ২০২১
দাম : দশ টাকা

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ভাবমূর্তি রক্ষা! রাষ্ট্রের না জনগণের?

ভাবমূর্তি বিষয়টা খুব গোলমেলে ব্যাপার। ঠুনকো ভাব আর কল্পিত মূর্তি নিয়ে অনেকে উত্তেজনায় কাটিয়ে দেয় সারাজীবন। সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকে এই বুঝি ক্ষুণ্ন হলো তার ভাব এবং ভেঙে গেল তার মূর্তি। কবি নজরুল লিখেছিলেন, যে জাত ধর্ম ঠুনকো এতো, আজ নয় কাল ভাঙবে সে তো। তেমন করে বলা যায়, যে ভাবমূর্তি ঠুনকো এতো আজ নয় কাল ভাঙবে সে তো। রাষ্ট্র বা ব্যক্তি সবার ক্ষেত্রেই বিষয়টা প্রযোজ্য।

রাষ্ট্র এবং সরকার এক নয়। ফলে সরকারের ভাবমূর্তি আর রাষ্ট্রের ভাবমূর্তিও এক কথা নয়। কিন্তু আজ যেন সব একাকার করে ফেলা হয়েছে। আবার রাষ্ট্র কিন্তু সমালোচনার উর্ধ্বে কিংবা অপরিবর্তনীয় কোন সংস্থা নয়। প্রতিটি রাষ্ট্রের যেমন সংবিধান আছে তেমনি তা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাও আছে। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র, সংবিধান ও সরকার নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা, সমালোচনা তাই এক অলংঘনীয় অধিকার হিসেবে বিবেচিত। যে রাষ্ট্র নাগরিকের এই অধিকার লংঘন করে তাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা যায় না।

কী এক অজানা আতঙ্কে শিউরে উঠছে যেন সবাই। সুনসান নিরব রাতে গাছের পাতা পড়ার শব্দেও একাকী পথিক যেমন আঁতকে ওঠে অনেকটা তেমন। এ যেন এক ভয়ের রাজ্যে ভয় পাচ্ছে সবাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়–সবল ভয় পায় বাঁধা পাবে বলে, দুর্বল ভয় পায় ব্যথা পাবে বলে। কিন্তু সবলের আঘাত করার ক্ষমতা আছে দুর্বলের তা থাকে না। আঘাত সহ্য করতে করতে প্রবলের আঘাতের বিরুদ্ধে কখনো কখনো দুর্বল যে ঘুরে দাঁড়ায় বা প্রতিরোধ করে সে দৃষ্টান্ত কিন্তু কম নয়। আর এ ধরনের আঘাত সহ্য করেও যে দুর্বলেরা প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ গড়ে তোলে তাদের শক্তি কিন্তু শুধুমাত্র দৈহিক বা সাংগঠনিক নয়, প্রধানত নৈতিক। যুক্তির ওপর ভর করে যে নৈতিক শক্তি গড়ে উঠে তা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পারে যে কোন প্রবল শক্তিকে। এরা কখনো একা অথবা কখনো একত্রিত হয়ে যখন কোন প্রতিরোধ গড়ে তোলে তা তখন যে কোন প্রবল শাসকের ভিত্তি কাপিয়ে দিতে পারে। অতীত থেকে এই শিক্ষা নিয়ে নিজেদেরকে সংশোধনের চাইতে প্রতিবাদকে গুড়িয়ে দেয়ার সাময়িক সুবিধাজনক পথেই হাটতে চান অনেকে।

কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে মুশতাক আহমেদ এর মৃত্যু নাড়িয়ে দিয়েছে অনেকের মানসিক স্থিরতাকে। তার মৃত্যুকে রাষ্ট্রীয় হেফাজতে হত্যা বলে মনে করছেন অনেকে। কারাগারে কোন মৃত্যুই জবাবদিহিতার বাইরে নয়। ফলে প্রশ্ন উঠতেই পারে, কারাগারে মুশতাক এর মৃত্যু কি কোন স্বাভাবিক ঘটনা? এককথায় উত্তর হচ্ছে, না। কারাগারে প্রেরণ করা অর্থ কাউকে স্বাভাবিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে শাস্তি দেয়া এবং তাকে রাষ্ট্রীয় হেফাজতে রাখা। মুশতাক ছিল রাষ্ট্রীয় হেফাজতে। তার নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। তার কোন গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা থাকলে তাকে চিকিৎসা করানো তো কারা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। নয় মাস ধরে মুশতাক কারাগারে। এই সময়কালে তেমন কোন স্বাস্থ্য সমস্যার কথা কি কারাগার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিলেন বা সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছিলেন? উত্তর জানা নেই। এরপর আকস্মিকভাবে জানা গেল মুশতাকের মৃত্যু সংবাদ। তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে। কিন্তু তার কথা বা লেখা রাষ্ট্রের কাছে কেন এত বিপজ্জনক মনে হলো, তা কিন্তু জানা গেল না। ফেসবুক ব্যবহার করে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে কুমিল্লার নাসির নগর, কক্সবাজারের রামু,পাবনার সাথিয়া, রংপুরসহ অনেক জায়গায় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপর হামলা হয়েছিল তার হোতাদের বিচার আর শাস্তি কি হয়েছে? মুশতাকের লেখার ফলে তেমন কোন পরিস্থিতি কি তৈরি হয়েছিল? সমাজের কোন অংশে অসন্তোষ এবং অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল এটা জানার কৌতূহল মিটবে কীভাবে?

কি লিখেছিলেন মুশতাক? কেন তার জামিনের আবেদন ৬ বার প্রত্যাখাত হয়েছিল? জামিন পাওয়ার অধিকার সবার। এই কথা আইন ও বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে যারা যুক্ত তারা সবাই জানেন এবং হরহামেশা বলেন। মুশতাক জামিন পেলে রাষ্ট্রের বা সমাজের কী বিপদ হতে পারতো বলে তার জামিন হয়নি, এসব জানার কৌতূহল সাধারণ মানুষের যেমন আছে তেমনি এখন সরকার সমর্থক অনেকেই বলছেন মুশতাক কোন লেখকই নন। বরং কয়েকদিন ধরে টেলিভিশন টক শোতে অনেকেই বলছেন তিনি কোন লেখক ছিলেন না। তার পরিচয় তিনি একজন ব্যবসায়ী। তাহলে তো বিষয়টা আরও গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কেন? চিরকুট লেখা, ফেসবুকে লেখা, কোন ব্লগে লেখা, বক্তৃতা করা, কোন তথ্য প্রকাশ করা ইত্যাদি যা রাষ্ট্রের কাছে বিপজ্জনক বলে মনে হবে তার বিরুদ্ধেই মামলা হতে পারে। বিপজ্জনক কিনা বা কতটুকু বিপজ্জনক তা নির্ধারণ করবে কে আর শাস্তিই বা দেবে কে? কী লেখা ছিল তার

বিরুদ্ধে করা অভিযোগপত্রে? কিছুই জানা হলো না। মুশতাকের এখন জামিনের আর প্রয়োজন নেই। মুশতাক নেই কিন্তু তার মৃত্যু রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি কতটা উজ্জ্বল করলো তা নিয়ে বিতর্ক চলবে বহুদিন।

আইন নিজস্ব গতিতে চলে, আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এই কথাগুলো এখন কাউকে স্বস্তি দেয় না কারণ কথাগুলো এখন আর সত্যকে প্রতিফলিত করে না। আইনের গতি কখনো রকেটের মতো দ্রুত আবার কখনো মনে করিয়ে দেয় সেই পুরনো গরুর গাড়ির ধীরগতির কথা। কার উপর প্রয়োগ হবে, কে প্রয়োগ করবে তা দ্বারাই নির্ধারিত হয় আইনের গতি। আর ক্ষমতা সেটা টাকার হোক বা রাজনৈতিক হোক তা দ্বারা নির্ধারিত হয় কতটা সমান বা অসমান হবে আইনের দৃষ্টি। মনে পড়ে জর্জ অরওয়েল এর সেই ব্যঙ্গোক্তি–সবাই সমান তবে কেউ কেউ একটু বেশিই সমান। কেউ সহজে জামিন পান আর কেউ বার বার প্রত্যাখাত হন। ফলে মনে হওয়াটা স্বাভাবিক যে আইন সবার জন্য সমান নয়। কিন্তু এই ভাবনা বিরাজ করলে সমাজে শুধু ভয়ের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তাই নয়, সমাজের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। আর ভারসাম্যহীন সমাজ মানে টলটলায়মান সমাজ। সেটা কারো কি কাম্য হতে পারে? চিরস্থায়ী ক্ষমতার স্বপ্ন দেখে অনেকেই হয়তো এই পরিস্থিতির পক্ষে সাফাই গাইতে পারেন কিন্তু তা কাউকে স্বস্তি দেবে না।

ক্ষমতায় থেকে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন যিনি আর যার উপর প্রয়োগ করা হয় দুজনের চিন্তা সবসময় এক ধরনের হয় না। মানুষের হাত বাধা যায়, চোখ বাধা যায়, পা বাধা যায় কিন্তু মন বাধা যায় না। চিন্তাকে আটকানো যায় না। সংবিধানে চিন্তার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ আরোপের সুযোগ রাখা হয়েছে। কিন্তু শাসকদের পক্ষ থেকে প্রবল বিধিনিষেধ দেখা গেলেও বিধি নিষেধের যুক্তিটা সবসময় খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং এটা এখন ভয় দেখানোর যুক্তিতে পরিণত হয়েছে। চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, সম্মতি উৎপাদন করার প্রক্রিয়া চলছেই সবসময়। তারপরও যদি চিন্তা কখনো শাসকদেরকে বিব্রত করে, বিরক্ত করে বা প্রতিবাদের মনন তৈরি করে তাহলে তা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আইনি বাধা তৈরি করার উদ্দেশ্যেই দমনমূলক আইন তৈরি করা হয়। আর যারা গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেন তারা সবসময় চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার কথা বলেন। যে কারণে ব্রিটিশ পরাধীনতার আমলে ইন্ডিয়ান সেফটি অ্যাক্ট, পাকিস্তান আমলে ডিফেন্স রুল অফ পাকিস্তান এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ১৯৬৯ সালে ১১ দফা আন্দোলনের ৯ দফায় বলা হয়েছিল–'জরুরি আইন আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।' কিন্তু তা তো প্রত্যাহার হলই না বরং স্বাধীনতার পর বিশেষ ক্ষমতা আইন, প্রিন্টিং প্রেসেস অ্যান্ড প্লাবলিকেশন অ্যাক্ট, সন্ত্রাস দমন আইনের প্রয়োগ আমরা দেখেছি। এখন দেখা যাচ্ছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের প্রয়োগ। কেউ কেউ বলছেন আইনের অপপ্রয়োগ হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে আইনটাই এমন যে এর প্রয়োগটাই মুক্ত চিন্তার জন্য ভীতিকর।

২০১৮ সালের অক্টোবরে ৬২টি ধারা সম্বলিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করার সময় থেকেই আশঙ্কা ছিল এর প্রয়োগের নামে ভীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হবে। আইনে বলা হয়েছে, ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত কোনো তথ্য-উপাত্ত দেশের সংহতি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, ধর্মীয় মূল্যবোধ বা জনশৃঙ্খলা ক্ষুণ্ন করলে বা জাতিগত বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টি করলে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী তা ব্লক বা অপসারণের জন্য টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসিকে অনুরোধ করতে পারবে। এক্ষেত্রে পুলিশ পরোয়ানা বা অনুমোদন ছাড়াই তল্লাশি, জব্দ এবং গ্রেপ্তার করতে পারবে। এর প্রতিটি বিষয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দাবি রাখে। তাই প্রতিবাদ করেছিলেন অনেকেই। ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে অনেক আশ্বাস, সান্তনা আর প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। আইনে বলা হয়েছে, ৬০ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে হবে। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে ১৫ দিন সময় বাড়িয়ে নিতে পারেন তদন্তকারী কর্মকর্তারা। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের বিচার হবে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে। অভিযোগ গঠনের ১৮০ কার্যদিবসের মধ্যে মামলার নিষ্পত্তি করতে হবে। তবে এর মধ্যে করা সম্ভব না হলে সর্বোচ্চ ৯০ কার্যদিবস পর্যন্ত বাড়ানো যাবে। কিন্তু প্রাক-বিচার শাস্তি কি অনন্তকাল চলতে পারে? যদি বিচারে কোনো আসামির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণিত না হয়, বিচারকের রায়ে তিনি বেকসুর খালাস পেয়ে যান। তাহলে যে একজন আসামি ১০ মাস বা আরও বেশি জেল খাটলেন তার কী হবে ?

অন্যায় করলে তার বিচার ও শাস্তি তো দিতেই হবে। অন্যায় কতটুকু তার প্রেক্ষিতে বিচার হবে এটাই কাম্য। যদি কে করেছে সেটা প্রধান বিবেচ্য হয় তাহলে জনগণের মধ্যে ভয় বাড়ে আর আস্থা কমে। এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, ভয়ের পরিবেশে গণতন্ত্র বাঁচে না, গণতন্ত্র থাকলে ভয় দেখানো লাগে না। তাই ভাবমূর্তি হারানোর ভয় নয়, গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তি বাড়ানোর কাজটাই জরুরি। গণতন্ত্রকে চলৎশক্তিহীন মূর্তি বানিয়ে ভাব দেখানোর জন্য তো দেশটা স্বাধীন হয়নি।